এরশাদ রঙ্গ ও লোভী মাকড়সার গল্প

আহসান মোহাম্মদ

আমাদের রাজনীতির আকাশের মেঘ কেটে যেতে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে। নির্বাচনপ্রিয় জনগণের চাপে বিরোধী দলের সরকার পতনের পদযাত্রা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী শোভাযাত্রাতে পরিণত হয়েছে। যে যাই বলুক নির্বাচনের হাওয়া শুরু হয়ে গেছে এবং সে হাওয়ার বিপক্ষে দাড়ানোর সাহস বিদেশবান্ধব সুশীল সমাজ কিংবা মিডিয়াবান্ধব বামপন্থীরা কেউ দেখাবে না। বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর তিনটি সরকার তাদের মেয়াদ পূর্ণ করতে যাচ্ছে এবং চতুর্থবারের মত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের পছন্দের দল ও ব্যক্তিগণকে ক্ষমতার বসাতে যাচ্ছে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো যেমন তাদের ঘর গোছাতে শুরু করেছে, তেমনি জোট সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাও চলছে পুরোদমে। ক্ষমতাশীন চারদলীয় জোট ও বিরোধী ১৪ দলীয় জোট যেমন ছোট ছোট দলগুলোকে তাদের জোটে টেনে এনে যত বেশী সম্ভব ভোট তাদের বাক্সে ফেলতে চাচ্ছে তেমনি ক্ষুদ্র দলগুলোও চেষ্টা করছে দর কষাকষি করে যত বেশী সম্ভব সুযোগ সুবিধা আদায় করতে। গত নির্বাচনের ফলাফল থেকে সকলেই জোটবদ্ধ নির্বাচনের উপকারিতা বুঝতে পেরেছে। জোট গঠন বা তাকে সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাকে খারাপ ভাবে দেখার কোন উপায় নেই। তবে, জোট সম্প্রসারণ ও জোটে যোগদানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা নানা আলোচনা ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এ বিষয়ে কারো কারো কোন কোন আচরণ যেমন তাঁদের মর্যাদার পরিপন্থি বলে মনে হচ্ছে তেমনি কিছু কিছু ঘটনাবলীতে দেশের সচেতন জনগণ উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছেন না। জাতীয় পাটির একাংশের চেয়ারম্যান সস্ত্রীক প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। তার কদিন পরে দলটির অন্য একটি অংশের নেতা প্রধানমন্ত্রীর সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হন বলে খবর বের হয়। তিনি পরদিন তা সরাসরি অস্বীকার করেন। অবশ্য তার পরের দিন তিনি আবার তা স্বীকার করেন। একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান, যিনি একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকও বটে, তিনি এতো সামান্য বিষয়ে এতো সহজে অসত্য বলতে পারবেন তা অনেকেই ভাবতে পারেনি। এর মধ্যে হঠাৎ করে গত ২৮ জুলাই তারিখে রাত দশটার দিকে কয়েকটি টিভি চ্যানেল ‘ব্রেকিং নিউজ’ প্রচার করে। খবরে জানা যায় প্রধানমন্ত্রীর পূত্র, যিনি তাঁর দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদকও বটে, এরশাদের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন। এরশাদের চার দলে যোগদান অনেকটা নিশ্চিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এরশাদ নিজেও জানিয়ে দেন যে তিনি চার দলেই যাচ্ছেন ১৪ দলে নয়।

এ ঘটনায় বিরোধী দল যে খুবই আশাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছে তা বোঝা যায় দলীয় নেত্রীর কথায়। তিনি বরাবরের মত এমন সব মন্তব্য করেছেন যাকে অশালীন মনে হতে পারে। তিনি এরশাদ ও জিয়া পরিবারকে চোর আখ্যায়িত করেন এবং বলেন যে চোরে চোর চেনে। কেউ অবশ্য প্রশ্ন করেনি যে তিনি যখন এরশাদকে চিনেছিলেন তখন প্রবাদ বাক্যটি প্রযোজ্য ছিল কিনা। এতোদিন বলা হচ্ছিল যে কেয়ারটেকার সরকার গঠনের পরপরই এরশাদকে নিয়ে ১৪ দল মহাজোট গঠন করবে। সে আশার শেষ দীপটি একেবারে নিভে গেল।

এরশাদকে জোটে নিতে বিএনপির আগ্রহ অস্বাভাবিক নয়। তবে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী পুত্র ও একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হয়ে তাকে জোটে আনার বিষয়ে আলোচনা করতে গেলেন তাতে অনেকেই অবাক হয়েছেন বৈকি। কি এমন ঘটলো যে এরশাদকে জোটে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীতনয় এতো ব্যাকুল হয়ে পড়লেন? এর পিছনের কারণ হিসাবে যে কয়টি মত রয়েছে তা হচ্ছেঃ

১. বিএনপি ক্ষমতায় রয়েছে আর মাত্র কয়েক মাস। এর মধ্যে এরশাদকে পক্ষে আনতে সমর্থ না হলে তিনি ১৪ দলে যাবেন এবং তার ফল ১৪ দলের পক্ষে ও চার দলের বিপক্ষে যাবে। মামলায় সাজা বা গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে তাকে এখনই চারদলে আনার ঘোষণা পাওয়া গেলে একদিকে যেমন বিরোধী দলের মহাজোট গঠনের প্রচেষ্টায় গুড়ে বালি পড়বে তেমনি তাদের কর্মী সমর্থকদের মনোবলও ভেঙ্গে দেয়া যাবে। পরবর্তীতে এরশাদ ১৪ দলে যেতে চাইলেও তার জন্য বিষয়টি খুবই কঠিন হয়ে পড়বে।

২. একটি গোয়েন্দা সংস্থা সম্প্রতি একটি 'অতি গোপনীয়' জরিপ সম্পন্ন করে তার ফলাফল প্রধানমন্ত্রীকে জানায়। তাতে বলা হয় যে আগামী নির্বাচনে সরকারী ও বিরোধী জোটের নিশ্চিত আসনের সংখ্যা সমান সমান। অতি গোপনীয় এই জরিপ অতি দ্রুত মিডিয়ায় পৌঁছে যায়। এর পরপরই বিএনপির হাই কমান্ড ভোটের রাজনীতিতে তাদের দলীয় ও জোটগত অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এই জরিপ ও তার অতি গোপনীয় ফলাফল মিডিয়াতে পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাহলে কি সাবেক সামরিক শাসকের সাবেক বন্ধুরা কোন কলকাঠি নাড়ছেন? নাকি প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে কোন আমলা কোন খেলা খেলছেন?

প্রশ্ন উঠছে যে ক্ষমতাশীন জোট নিজেদের জনপ্রিয়তা ও গণভিত্তিকে কি ছোট করে দেখছে? এ কথা সত্য যে চারদলীয় জোটকে ক্রমাগত মিডিয়া যুদ্ধ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। কোন এক রহস্যময় কারণে আমাদের মিডিয়া কর্মীগণ বিরোধী দলটিকে খুব বেশী ভালোবেসে ফেলেছেন বলে মনে হয়। একটি ছোট্ট উদাহরণ - একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলে হ্যালো মিনিস্টার নামে মন্ত্রীদেরকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করে থাকে। গত কয়েকদিন আগের এরকম একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী। তাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করার এক পর্যায়ে একজন সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল এরকম, 'আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে দুস্থ ও বিধবা মহিলাদের ভাতা চালু করে। আপনারা তা বন্ধ করেন নি ..'। লক্ষনীয় যে প্রশ্ন করার ছলেও তিনি বিরোধীদলের একটু গুনগান গেয়ে নিলেন। প্রতিমন্ত্রী অবশ্য তার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছিল বিএনপির গত টার্মে। এমনকি যে সব টিভি চ্যানেলকে সরকারী দলের নেতাদের মালিকানাধীন বলে জানা যায় তারাও এ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকতে চায় না। কিন্তু কেয়ারটেকার সরকারের সময়ে এ পরিস্থিতি সম্ভবতঃ থাকবে না। কেয়ারটেকার সরকারের তিন মাস অনেকটা 'বাফার' সময়ের মত কাজ করে । সরকারী দল ও বিরোধী দল তখন এক কাতারে চলে আসে। ফলে মিডিয়া ও জনগণ দুই দলকে একই পাল্লায় বিচার করার সুযোগ পায়। বিগত সরকারের পাঁচ বছরের শাসনামলের সাথে বর্তমান সরকারের শাসনামলকে তুলনা করে এ সরকারের ভালো কাজগুলোকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করার সুযোগ পাবে জনগণ। বিগত সরকারের স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী একটা লাশের বদলে দশটি লাশ ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর কর্মী বাহিনীকে এবং জয়নাল হাজারির মত সন্ত্রাসী নেতার নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নিজে অংশ নিয়েছিলেন, এমনকি ক্ষমতা থেকে নেমে যাবার সময়েও তিনি সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় বাসভবনটি। তারপরও দেখা গেছে পূর্ববর্তী নির্বাচন থেকে দলটির ভোট না কমে বরং বেড়েছিল। সেখানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দলীয় বিবেচনার উর্দ্ধে উঠে সন্ত্রাস দমনে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই সন্ত্রাস দমনে তিনি যা করেছেন তা বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রনায়ক করতে পারেননি। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ছাড়াও জঙ্গী দমন, প্রতিকুল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, পাবলিক পরীক্ষাকে নকল মুক্ত করার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি খাতে ভর্তুকী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার যথেষ্ট সফল হয়েছে। এতো সফলতার পরও সরকারী জোটের ভোট কমে যাবার তেমন কোন কারণ কি আছে?

আবার এ প্রশ্নও উঠছে যে বিএনপি কি এরশাদের জনসমর্থনকে অতিরঞ্জিত করে দেখছে? ১৯৯৬ সালে যেখানে দলটি ১৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল সেখানে ২০০১ এ পেয়েছে ৭ শতাংশ। গত পাঁচ বছরে দলটির কয়েকবার ভাঙ্গনের মুখোমুখি হয়েছে, এরশাদের তরুণী ভার্যা তাঁর বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছেন। সর্বোপরি যেখানে প্রধান তিনটি দল নিয়মতি সভা সমাবেশ করে, প্রতিনিয়ত মিডিয়া যুদ্ধ চালিয়ে এবং অন্যান্য সাংগঠিনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে নিজেদের জনসমর্থন ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে দলটির তেমন কোন সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে দলটির জনসমর্থন ২০০১ থেকে বৃদ্ধি পাবার এমনকি ২০০১ এর অবস্থায় থাকার কোন কারণ খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। দলটির নেতা-কর্মীরা অনেকেই ইতোমধ্যে বিএনপি ও আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছে। কেউ কেউ আবার বিদিশার নেতৃত্বে নতুন দল গঠন করেছে।

৩. বিএনপির গত বেশ কয়েক মাসের কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দলটি ক্ষমতা হস্তান্তরের বাকী কয়েকটা মাস অতি প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী দল ও মিডিয়াকে এমন সব ইস্যুতে ব্যস্ত রাখার কৌশল নিয়েছে যা ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে। যেমন নির্বাচন কমিশন ও ভোটার তালিকা বিতর্কে ক্ষমতাশীনদের হাত রয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদও হচ্ছে এবং অর্থমন্ত্রণালয় টাকাও দিচ্ছে। এরশাদের ইস্যুটি সামনে আসাতে রাজনীতির অঙ্গন অন্ততঃ আরও মাসখানেক তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। বিরোধী দল নির্বাচন সংস্কারের ইস্যুতে কিছু করার সুযোগ ও সময় পাবে না।

৪. এরশাদকে জোটে নেয়ার জন্য বিএনপির আকুলতাকে অনেকে আবার দেখছেন জোটে প্রধান ইসলামি দলটিকে চাপে রাখার কৌশল হিসাবে। এরশাদের রাজনীতি হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু। দিনে দিনে তা ক্ষয় হতে হতে কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। বড়জোর তা চলবে তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত। অশীতিপর এই বৃদ্ধ কতদিনই বা পারবেন রঙচঙে পোষাক পরে, তরুণী পরিবিষ্ট থেকে আর বাহারী গলাবন্ধ দিয়ে বয়সের প্রমাণ তাঁর গলার ভাঁজগুলো ঢেকে রাখতে? বলিরেখার সাথে পাল্লা দিয়ে বার বার তার দল ভাংছে, ঘর ভাংছে এবং সরে যাচ্ছে নেতা-কর্মীরা। অপরদিকে দেশের প্রধান ইসলামি দলটি একটি উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। গত পাঁচ বছরে সরকারে থাকায় অনুকুল আবহাওয়া পেয়ে দলটির সংগঠন ও জনপ্রিয়তা যে কত বৃদ্ধি পেয়েছে তা কয়েকমাস পূর্বে তাদের মহাসমাবেশে জনসমাগম থেকে বোঝা যায়। জঙ্গীবাদ উত্থানের ক্ষতি কাটিয়ে উঠেও তারা যে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে পেরেছে তা দেখে সকলেই বিস্মিত হয়েছিল। তাছাড়া আরেকটি বিষয়ের কথাও অনেকে বলছেন। যাই বলা হোক না কেন আদর্শ, সততা ও নৈতিকতার বিচারে দলটির সাথে তার জোটের শরীকরা কিংবা বিরোধী জোটের প্রতিদ্বন্দ্বীরা পেরে উঠতে পারছে না। বিএনপির কয়েকজন মন্ত্রী প্রকাশ্যেই অনেকবার তাদের ছাত্র ও যুব নেতা-কর্মীদের ভৎর্সনা করে বলেছেন ওদের মত হতে পারো না! এর ফলে অনেকক্ষেত্রে ক্ষমতাশীন দলের নেতা-কর্মীরা নৈতিক মনোবল সংকটের সম্মুখীন হয়ে থাকে। তাছাড়া অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাদের সাথে বিএনপিকে আসন বন্টন নিয়ে দর কষাকষিতে

লিপ্ত হতে হবে। পত্র-পত্রিকার খবরে দেখা যাচ্ছে যে অর্ধ শতাধিক আসনকে টার্গেট করে তারা গত পাঁচ বছর ধরে নির্বাচনী কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। জেতার সম্ভাবনা বিচার করে সে সকল আসনে তাদের প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়ার দাবী জানাবে তারা। এরশাদকে জোটে আনার ফলে আসন ভাগাভাগির দরকষাকষিতে দলটিকে দুর্বল করে দেয়া যাবে। সম্প্রতি আরেকটি ঘটনা বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত দুই শীর্ষ জঙ্গী নেতাকে কনডেম সেলে রাখার বদলে একটি সরকারী বাড়িতে অপ্রতুল নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করা রয়েছে। মিডিয়া ও বিভিন্ন মহল থেকে বার বার বিষয়টির কঠোর কঠোর সমালোচনা করা হলেও সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল রহস্যজনকভাবে নীরব রয়েছে। বিষয়টিকে অনেকে দেখছেন ইসলামি দলগুলোকে চাপের মধ্যে রাখার সরকারী কৌশল হিসাবে, কেননা এ ধরণের ঘটনার সাথে বিরোধী দল ও মিডিয়া খুব সহজেই ইসলামী দলগুলোকে সম্পৃক্ত করে ফেলতে পারে। জঙ্গীবাদের ইস্যু আসলেই ইসলামি দলগুলোকে চাপের মুখে রাখা সহজ হয়। ইতোপূর্বে দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার পরও জঙ্গীদেরকে ধরার ব্যাপারে সরকারের রহস্যজনক শিথিলতাকে অনেকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছিলেন।

আপাতঃ দৃষ্টিতে এরশাদের সরকারী জোটে যোগদানকে বাঁকা চোখে দেখার কোন কারণ নেই। যে জোট গত নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী আসনে নির্বাচিত হয়েছে, তার সাথে যোগ দিয়ে তিনি ভবিষ্যতে ক্ষমতার ভাগ নিতে চাইতেই পারেন। তাছাড়া তাঁর মামলা মোকাদ্দমা ও বিদেশী ব্যাংকে তাঁর প্রচুর অর্থ - এ সকল কারণেও তাঁর প্রয়োজন ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা। তবে তাঁর অতীত সম্পর্কে যারা জানেন, তারা বিষয়টিকে এতো সরলভাবে নিতে পারছেন না। বিশেষ করে ক্ষমতাশীন জোটের প্রতি সহানুভূতিশীলেরা উদ্বিগ্ন। যতই বলা হোক না কেন যে তাঁর ও বিএনপির আদর্শ একই - বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধ, বিভিন্ন সময়ে জাতি তাঁকে ভিন্ন রূপেই বেশী দেখেছে। বিরোধী দলের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রতিবেশী দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে তাঁর নিয়মতি জোগাযোগের বিষয়টি অনেকবারই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। দেশটি সফরকালে তাঁর তরুণী স্ত্রীর ব্যাংকে কয়েকমত কোটি টাকা জমা হয়। বিগত সরকারের আমলে দেশটির রাষ্ট্রদূত তাঁর সাথে জেলে দেখা করে তাঁকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনেন ও বিনিময়ে তৎকালীন সরকারের প্রতি তাঁর সমর্থন নিশ্চিত করেন। তাঁর আমলে বার বার তিনি বর্তমান বিরোধী দলের সাথে আঁতাত করেছেন, এমনকি বিরোধী নেত্রীর সাথে লং ড্রাইভেও গেছেন। ফলে চার দলের প্রতি সহানুভূতিশীলরা ভয় পাচ্ছেন যে সরকারী জোটে যোগ দেবার ঘোষণা দিয়ে তিনি তাঁর মামলাগুলো তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করবেন এবং তারপর তাঁর ১৪ দলে ফিরে যাবেন বা ১৪ দলের সাথে একটি কৌশলগত ঐক্য করবেন। এর মধ্যে দলীয় বিবেচনায় দুর্নীতির মামলা তোলার মত দুর্নাম এবং শাসক দল ও জোটের মধ্যে অন্তঃবিবাদ সৃষ্টির মত ক্ষতি জোটকে উপহার দিয়ে যাবেন। চারদলীয় জোট গঠন করার পরও তিনি একই ধরণের কিছু কাজ করেছিলেন। জোটের সব থেকে বড় শক্তি হচ্ছে বিএনপি ও জামায়াতের ঐক্য এবং সব থেকে বড় দুর্বলতা হচ্ছে বিএনপির দলীয় কোন্দল। গত নির্বাচনে প্রধান দুটি দলের অনেক প্রার্থীই পরাজিত হয়েছে নিজ দলের বিদ্রোহী প্রার্থীর কারণে। বিএনপি-জামায়াত সম্পর্কে চিড় ধরানোর জন্য বিরোধী দল সম্ভাব্য সকল পথ অবলম্বন করেও যে সফলতা আসেনি, তা এরশাদকে জোটে নেবার কথাবার্তা শুরু হতেই আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অপরদিকে এরশাদকে জোটে নিলে বিএনপির দলীয় কোন্দলও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। দলটির দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সে ইঙ্গিতই দিয়েছেন।

এরশাদের ব্যাপারে একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে তিনি অতিশয় ধূর্ত ও কৌশলী। তাঁর শাসনামলে তিনি বহু জাদরেল নেতাকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তাঁদের দলের সাথে বেঈমানী করিয়েছিলেন। আবার

উদ্দেশ্য সাধন হয়ে গেলে তিনি তাদেরকে পরিত্যাক্ত ন্যাপকিনের মত ছুড়ে ফেলে দিতেও দ্বিধা করেননি। বহু জাদরেল নেতা তাঁর খপ্পরে পড়ে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নষ্ট করেছেন। তবে এর পিছনে এরশাদের কুটকৌশল যেমন কাজ করেছে তার থেকে বেশী কাজ করেছে উক্ত নেতাদের মাত্রাতিক্ত লোভ ও আদর্শহীনতা। রাজনীতিতে কম কৌশলী বলে পরিচিত ইসলামি দলটির সাথেও তিনি কিন্তু পেরে ওঠেননি। উক্ত দলটির সংসদ সদস্যরা যখন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে তখন তিনি সংসদ ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হন।

এরশাদ রঙ্গের লাভ-ক্ষতির হিসাব কষতে গিয়ে একটি গল্প মনে পড়লো। একটি মাকড়সার ছিল অসম্ভব লোভ। যেখানেই ভোজ হতো সেখানেই সে ভাগ বসাতে চেষ্টা করতো। কিন্তু অনেক সময় ভোজের খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যেতো। তার ছিল অনেকগুলো ছেলে। কোন ভোজ যেন মিস না হয় সেজন্য এক এক ছেলেকে সে এক এক দিকে পাঠালো। সাথে দিল একটি করে সুতো। সুতোর অপর প্রান্ত সে নিজের কোমরে বেধে রেখে ছেলেদেরকে বললো যে ভোজের খবর পাওয়া মাত্রই যেন তারা সুতোতে টান দেয়। ছেলেরা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে একটা সুতোয় টান পড়লো। লোভী মাকড়সা যেই সেদিকে পা বাড়াবে তখন পড়লো আরেক সুতোয় টান। এভাবে একে একে সব গুলো সুতোতেই টান পড়তে থাকলো। চারিদিক থেকে অসংখ্য সুতোর টানে মাকড়সার কোমর সরু হতে হতে একসময় তার দেহটাই দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়ে সে অক্কা পেল।